“ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি----------”

(চূড়ান্ত ইট কাঠের মধ্যে থাকলেও যার মনের মধ্যে আছে এক বিশাল প্রকৃতি, সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ এবং লেখক আবদুল্লাহ আবু সাঈদের ৭৪তম শুভ জন্মদিনে উৎসর্গ করে এই লেখা।)

লোকজনের মধ্যে থাকা আর গাছপালার সাথে থাকা এক কথা নয়। সবাক এবং নির্বাকের ভুমিকা যথার্থই আলাদা। এদের মিশে যাবার ধর্মও ভিন্ন। মিত্রতা যেন এদের শিরা উপশিরায় মজে থাকে। তাই নির্বাক হলেও প্রকৃতি সম্মোহন করে বহুগুন বেশী। তবে এই নির্জন সৌন্দর্য বেশীক্ষন সহ্য করতে পারিনা। বাহ্যজ্ঞান কেমন যেন নষ্ট করে ফেলে। মন ফাঁকা হয়ে যায়। বাক্যহারা মন পড়ে যায় অন্য কিছুতে।

এইমাত্র দক্ষিন ঘরের জানলা গলে নরম রোদ এসে পড়ল। ঠিক রোদ না। দুরন্ত যৌবনার ফেটে পড়া গায়ের রঙ। সেই রুপময় আভা যেন নরম হয়ে ঢলে পড়ল সিরামিকের ছোট্ট গোল টেবিলটার উপর। আমার হাতের মুঠি ভরে সেই রোদ। সেই নরম আলো। আমার আঙ্গুলের কোল, লেখারা খাতা, সব ভরে গেল। উপচে গেল বললেই বোধহয় ঠিক হোত । এই মূহুর্তে কেউ সাথে থাকলে ভালো লাগত। এমন কেউ, যে বোঝে হৃদয়বত্তা কি জিনিষ।

মাঝে মাঝে একলা হয়ে যাই। এরকম একলা যে দুনিয়াতে বলতে গেলে তখন আমার আর কেউ থাকেনা। একা থাকতে আমার কোনদিন খারাপ লাগেনা। নির্জনতার মধ্যে একধরনের সম্মহনী শক্তি আছে। টের পাই। তবে শহরে এত কাক! তারাই সমস্ত নির্জনতাকে ভেঙ্গে দেয়। রাত বিরেত বোঝেনা। নির্জনতা বোঝেনা। মধ্যরাতেও দেখি ডেকে ওঠে। তাদের সংসারে বনিবনাত আছে কিনা কেজানে। তবে ‘কা’- এর মত একটি মাত্র অক্ষর দিয়ে তারা যে এত কথা কি করে বলে, সেটাই আশ্চর্য।

শোবার ঘরের জানলা খুলে দিলে বাড়ীর পিছনের বাগানটা ডাকতে ডাকতে বিনা জিজ্ঞাসায় আমার ঘর পর্যন্ত চলে আসে। বাগানটা বড় কিছু নয়। কিন্তু তার যে কি শ্রী! যখন সূর্য ওঠে আর গাছেদের মাথায় আশীর্বাদের মত তার আলো পড়ে তখন এক আশ্চর্য সবুজ আলোয় চারপাশ ভরে যায়। রঙ্গন আর মাধবীলতার এমন ঐশ্বর্য আমি সত্যি আগে দেখিনি। তাদের চারপাশ ঘিরে বড় বড় আম গাছ। স্নেহ পেয়ে সেই গাছের কোল সাপটে উঠে গেছে মানিপ্ল্যান্ট। বড় বড় গাঢ় সবুজ পাতা। যেন সবুজ রঙ্গের হাতপাখা। একে অন্যেরে জড়িয়ে কি যে নির্ভরতা তাদের! কি যে স্নেহ!

গাছপালা দেখার সময় চশমা খুলে রাখি। ভালো লাগেনা। চশমা চোখে যাই দেখি, মনে হয় নকল। কাছেরও মনে হয়না। কেমন যেন পরপর লাগে। ক'দিন ধরে দেখছি, আমের মুকুল ছেয়ে গেছে। গাছ ভরে চাপা খুশী। ফলবন্ত হবার অহংকার। মুগ্ধ হয়ে দেখি। পাশের আতা গাছের কয়েকটা ডাল আমার বারান্দার গ্রীল ধরার চেষ্টা করছে। দোতলা বলে এই পর্যন্ত আসতে তাদের খুব একটা কষ্ট হবেনা। ডাল ভরে গোছা গোছা কচি পাতা। দেখলে মনে হয় শিশুর দুধেল গা। রোদ আর বাতাস পেয়ে তারা যখন তখন মাথা দুলিয়ে হাসে। কিছুক্ষন তাদের সবুজ নরম গালে হাত বোলাই। কখনও বৃষ্টি পড়লে দেখি পাতাগুলির চারপাশ ঘিরে সারি সারি বৃষ্টির ফোটা জমে থাকে। এই কি 'জলমতির দানা'? তাই হবে। হলদে ঝরা পাতা বাতাসে পাক খেতে খেতে আস্তে করে মাটিতে পড়ে গেলে বুঝি, এই হলো -চলে যাওয়া।

এইখানে গাছগাছালী সবাই নিজেদের মত বেড়ে ওঠে। যেমন খুশী। পুরো বাগানের মাটি ঘাসে ডোবানো। কোনা ঘিরে প্রচুর আগাছা। তবু কেন জানি বুনো জঙ্গল বলতে ইচ্ছে করেনা। দেখে মনে হয় বাগান জুড়ে কাঠবেড়ালী, পাখী আর প্রজাপতিদের ভরা রাজপাট। ধুলোমাটির মধ্যে কি যে আয়োজন! মৌমাছিরা দুলে দুলে ওড়ে। গুনগুনায়। আপনজনের মত কিছুক্ষন পরপর কোত্থেকে যেন পাখীরা উড়ে এসে বসে। অনবরত ডাকে। খানিকক্ষন জিরোয়। ঠোট ঘষে। ডানা ঝাপটায়। এদিক ওদিক চেয়ে আবার কি মনে করে উড়ে যায়। এমন স্বাধীন যে হিংসে না করেই পারা যায়না।

আম গাছের কয়েকটা ছোট ছোট ডাল আর পাতা জড়িয়ে মাকড়সা নিঁখূত করে জাল বুনে রেখেছে। বাতাসে সেই ফিনফিনে জাল একটু পরপর নড়ে ওঠে। পোকামাকড় উড়ে বেড়ায় । নিঃশব্দে গাছ বায়। পিপড়ের দল চুপচাপ সারি বেঁধে হাটে। বিরামহীন। কোনদিন কোন পিপড়েকে বসে থাকতে দেখিনা। হাটার এত শক্তি কোত্থেকে যে পায় তারা! ক্ষুদ্র শরীর। তবু পাহাড় পর্বত ডিঙ্গোতেও তাদের আটকায়না। জীবের জীবন। চড়াই উৎরাই ছাড়া আর কি! তবু ধীরস্থির হেটে হেটে ঠিক চলে যায়।

বাগানের ডানদিকটায় নিম আর কৃষচূড়া একে অন্যের গা জড়িয়ে থাকে। দেখি পাতাপত্রের নিস্পাপ চুম্বন। যে যার মত ছায়া দেয়। ফুল দেয়। তাদের কোল ঘেষে বসে থাকে ঘন কামিনীর ঝোপ। কি সুন্দর করে যে মিলে মিশে থাকে গাছ আর পাখীরা! কেউ কাউকে তাড়া করেনা । উচ্ছেদ করেনা। অশান্ত করে তোলেনা এই শান্ত শ্রীময় ঘর গেরস্থালী। বেশ কয়েকটা নারকোল গাছ বাগান ঘিরে দাড়িয়ে থেকে অনবরত পাহারা দেয় তাদের এই সুখ শান্তি। নিস্পলক দেখি। সবকিছু বড় আপন মনে হয়।

এই মিত্রতা চেয়ে দেখার মত এক দূর্লভ সম্পদ। মানুষ যা খুইয়ে ফেলেছে বহুকাল আগে। কত কাল তা কেউ জানেনা! এই বিরল সম্পদ খুইয়ে মানুষ কি একবারও টের পেয়েছে তার নিঃস্ব হওয়ার খবর? বুঝেছে তার দারিদ্রতাকে ? যেমন করে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের খবর তারা জেনেছিল একদিন?

সুর অসুরে সমুদ্রমন্থন কারো অজানা নেই। দুই অমিত্র দল। তাদের চিরকালের বোঝাপড়া। পুরনো বিবাদ বিসম্বাদ। সেই আমাদের দূর্ভাগ্য। প্রকৃতি আশ্রয় বোঝে, প্রশ্রয় বোঝে। সৃষ্টিকর্তার মহানুভবতার কাছে তারা নত থাকে। যেমন মানুষেরও থাকার কথা ছিল। থাকেনি। থাকতে পারেনি। মানুষকে প্রকৃতি থেকে এমন আলাদা করে কে দিল? সেই মানুষইতো!

এদিকটায় আর তেমন কাউকে দেখিনা। কে যে কোথায় থাকে! দু'এক সময় নীচতলায় মানুষজনের কথাবার্তা শুনি। ঐটুকুই। তারা বোধহয় খুব হিসেব করে সময় খরচ করে। তাই এখানে আসেনা। বসেওনা। এমনই হয়। যার যা থাকে, তার দিকে খুব কমই ফিরে তাকায় মানুষ। শুধু খুব ভোরে একজন এসে বাগান সাফ করে দেয়, দেখি। সময় সময়

তার সঙ্গিনীকেও দেখি। সেও ঝাটপাট দেয়। এরা বোধহয় এ বাড়ীর মাইনে করা পুরোনো লোক। মাঝেমাঝে লোকটা তাকে ‘জয়ী’ বলে গলা ছেড়ে ডাক দেয়। ডাক ফুরানোর আগেই জয়ী দৌড়ে আসে । মনে হয় এটাই তার ডাক নাম। তাদের দেখতে আদিবাসীদের মত লাগে। ঐরকমই চেহারা। দু’জনের একজনেরও বয়স বুঝতে পারিনা। তবে মনে হয় পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে দুজনারই। শরীরে তবু পাথুরে মূর্তির আদল। জয়ীর শাড়ী পরার ঢংও দেখার মত। কোমর পেঁচিয়ে কি নিখুঁত ভাজ! মাথার উপর আটো করে বাঁধা শীবের মত বিশাল খোঁপা। খুলে দিলে ঠিক মাটি ছোঁবে। তাতে আবার গোটা কয়েক রূপোর কাঁটা। এত পারিপাট্য নিয়ে সে যে ধুলোবালির কাজ করে বোঝাই যায়না।

রোজদিন তারাই এসে সাফ সাফাইয়ের কাজ করে। যত্ন করে। পাতা শোরে। গাছগাছালীর খোঁজ খবর তারাই করে। সূর্য ওঠার আগে পানি দেয়। গাছেরা আকণ্ঠ পান করে সেই পানি। গাছেদের সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। ডাল, পাতা, অস্থি কান্ড। সাত সকালেই যেন নেয়ে ধুয়ে ওঠে তারা। আমিও ভিজে যাই। এমন শুভময় সকাল দেখার আনন্দে। ভাবি, ভাগ্যবান মানুষ এরা। তাই এমন ভোরে গাছেদের সতেজ সান্নিধ্য পায়। স্পর্শ করে। ফুলের এমন রঙ চোখ ভরে দেখে। পাখীদের ডাক শুনতে শুনতে একদিন হয়ত ওদের ভাষাটাও শিখে ফেলবে।

ভোরের এই বিচিত্র ছবির মধ্যে মনটাকে ছেড়ে দেই। এমন সম্মোহনকারক সকাল আমার সব যেন ধুয়ে দেয় রোজ। প্রকৃতি ছাড়া ভিতরের ক্লেদ, অহং, ক্ষুদ্রতা আর সমস্ত অভাববোধকে এমন যত্ন করে আর কে মুছে দিতে পারে? সৃষ্টিকর্তার এই মহানুভবতার কাছে আনত থাকি। আর মোহাচ্ছন্ন হয়ে দেখি, দিন আসছে- আকাশ আলো করে।

ডালিয়া নিলুফার